Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া শাম্মী দৃষ্টি

রোলঃ 216022012

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া শাম্মী দৃষ্টি

রোলঃ 216022012

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

1. এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া শাম্মী দৃষ্টি, আইডিঃ 216022012 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

দৃষ্টি

(স্বাক্ষর)

সামিয়া শাম্মী দৃষ্টি

আইডিঃ 216022012

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইসলামি শরীয়ত ও জীবনব্যবস্থার বুনিয়াদি দুই উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ, যা ওহী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। এই দুইটি উৎসের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন, যা ক্বিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। এই উৎসদ্বয়ের মধ্যে প্রথম উৎস তথা পবিত্র কুরআন ইসলামী শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা মানবজাতির জন্য চিরন্তন হেদায়াতবাণী। আর সুন্নাহ হলো কুরআনের এই মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা, না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত এবং তাঁর কর্ম ও স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত পথনির্দেশিকা। এতদুভয়ের সমন্বয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম।

আজকে আলোচ্য বিষয় আহলে কুরআন বা আহলুল কুরআন। আহলে কুরআন অথবা আহলুল কুরআন নামটি খুবই সুন্দর। যার অর্থ হলো আল কুরআনের অনুসারী দল। এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনি পরিভাষা। রাসূলে কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জবান মোবারকে উচ্চারিত শব্দ। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর আহল। অর্থাৎ আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?' আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- 'যারা আহলুল কুরআন-কুরআনওয়ালা, তারাই আল্লাহর আহল এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন।' (সুনানে নাসায়ি : ৭৯৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৫)

কিন্তু বর্তমান যুগে হাদিস অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফেরকার লোকেরা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে দাবী করে। অথচ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে হাদিস তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ রয়েছে। যা তারা মানে না। বস্তুত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একটি

বাস্তব চিত্র হলো ভ্রান্ত ফেরকা আহলে কুরআন। আহলে কুরআনওয়ালারা সরাসরি হাদিস মানে না। অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতে হাদিস মেনে চলা ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এর আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে।

আল কুরআন কী এবং হাদিস কী

আল কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত চতুর্থ আসমানি কিতাব। এই কিতাব আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে ইসলামিক নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে মৌখিকভাবে ভাষণ আকারে কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন,দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ৪০ বছর এবং অবতরণ শেষ হয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তিরোধানের বছর অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে থাকেন কুরআন হচ্ছে মুহাম্মদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা যা তার নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ এবং ঐশ্বরিক বার্তা প্রেরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় যা আদম থেকে শুরু হয়ে মুহাম্মাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তবে সুফিবাদের অনুসারীরা বিশ্বাস করে থাকেন মুহাম্মাদের সকল কর্মকান্ড উম্মতের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়। কুরআনের আয়াতসমূহে কুরআন শব্দটি ৭০ বার এসেছে। ইসলামি ইতিহাস অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড অংশে এটি ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অবতীর্ণ হয়। ইসলামের অনুসারীরা কুরআনকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে বিশ্বাস করে। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। আয়াত বা পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৬,২৩৬ টি; মতান্তরে ৬,৬৬৬ টি। এটি মূল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। মুসলিম চিন্তাধারা অনুসারে কুরআন ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং গ্রন্থ অবতরণের এই ধারা ইসলামের প্রথম বাণীবাহক আদম থেকে শুরু হয়। কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যার সাথে বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্মীয়গ্রন্থের বেশ মিল রয়েছে, অবশ্য অমিলও কম নয়। তবে কুরআনে কোনো ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। ইসলামি ভাষ্যমতে কুরআন অপরিবর্তনীয় এবং এ সম্পর্কে মুসলিমরা কুরআনের সূরা আল-হিজরের (১৫ নং সূরা), ৯ নং আয়াতের কথা উল্লেখ করে থাকে, এবং তা হল:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۝

অর্থ: নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।

[Reference: Wikipedia]

এবার জানা যাক হাদীস কী। হাদীস শব্দটি অভিধানে الجديد من الأشياء অর্থাৎ নতুন বস্তু বা নবসৃষ্ট বিষয় কিংবা বস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর বহুবচন হয় حداث ও حَدَّاء -যার বিপরীত শব্দ হল কাদীম (قديم) বা পুরাতন, অনাদি-অনন্ত। যেহেতু কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী অনাদি-অনন্ত, তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীকে হাদীস বলে নামকরণ করা হয়েছে। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী আল্লাহর কালামের ন্যায় অনাদি-অনন্ত নয়।

আবার হাদীস শব্দটি অভিধানে কথা বা বাণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর বহুবচন হয় احاديث | সম্ভবত حديث الرسول বা 'রাসূলের কথা' এই সম্বন্ধ পদটির বহুল ব্যবহারের কারণে মুযাফ ইলাইহে-কে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র حديث শব্দটি উল্লেখ করে "হাদীসে রাসূল" বুঝানোর প্রবণতা থেকে হাদীস শব্দটি রাসূলের বাণীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও যে কোন ব্যক্তির কথাকেই আভিধানিকভাবে হাদীস বলা যায়; এমনকি স্বপ্নের বিবরণকেও কুরআনে কারীমে হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيث অর্থাৎ স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০১)

তথাপি অন্য মানুষের কথার তুলনায় রাসূলের কথা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে তাঁর কথাকেই মূলত কথার মত কথা বলা যায়। তাই হাদীস বলে তাঁর কথাকেই বিশেষভাবে বুঝানো হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أوصفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام.

অর্থাৎ রাসূল সা.-এর কথা, কাজ, মৌন অনুমোদন, তাঁর গুণাবলী এমনকি নিদ্রা ও জাগরণের যাবতীয় আচার-আচরণকে হাদীস বলা হয়। (ফতহুল মুগীস সাখাবী কৃত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১০)

কেউ কেউ হাদীসের সংজ্ঞা আরো বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন। তাদের মতে

الحديث: هو أقوال النبي - وأفعاله وسهوه وتقاريره وتروكه وما هم به ففعله أو لم يفعله، وأحواله وشمائله وصفاته الخلقية والخلقية حتى الحركات والسكنات في اليقظ وَالمَنامِ سَوَاءٌ كَانَ كل ذلك قبل البعثة أو بعدها

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা, কাজ, ভুল, মৌন অনুমোদন, বর্জন এবং তিনি যা করতে ইচ্ছা করেছেন তা বাস্তবায়ন করে থাকুন বা না করে থাকুন এবং তাঁর অবস্থাসমূহ, জীবনচরিত, তাঁর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমনকি তাঁর নিদ্রা-জাগরণের যাবতীয় আচার-আচরণকে হাদীস বলে; তা নবুয়তের পূর্বের হোক বা পরের। (ফতহুল মুগীস সাখাবী কৃত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৬)

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা, কাজ, ও সমর্থনকে এবং তাদের ফতওয়াকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। (মুকাদ্দামায়ে মিশকাত পৃষ্ঠা ৩)

আল্লামা ইবনে হজরও উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বযুগীয় মনীষীগণ অবশ্য সাহাবী, তাবেঈন এবং তায়ে তাবেঈনদের কথা কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফতওয়া সমূহের উপরও হাদীস শব্দটি ব্যবহার করতেন।

আহলে কুরআন কারা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاه" . ُ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি’ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকাবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য বা নিষেধাজ্ঞা পৌছাবে, তখন সে বলবে, আমি অবহিত নই। আমরা যা আল্লাহ্র কিতাবে পাবো শুধু তারই অনুসরন করবো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৫)

কুরআনবাদী বা আহলে কুরআন হলো ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যারা শুধুমাত্র কুরআনকে ইসলাম ধর্মের বিধান ও আইন হিসাবে মানে ও বিশ্বাস করে। তারা অবশ্য কুরআন ওনলি বলেও নিজেদের পরিচয় দেয়। তারা হাদিস,ইজমা ইত্যাদিকে ইসলামের বিধান ও আইন হিসাবে মানে না।তাদের যুক্তি হল, কুরআন হলো পুর্নাঙ্গ ও সুবিস্তারিত গ্রন্থ; তাই কুরআনের কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই এবং তাদের মতে, ইসলামের নবী কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করতেন না। তাই কুরআন অনুসরণ করলেই তাকে অনুসরণ করা হয়ে যায়।

চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার আজ মুসলিম উম্মাহ। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে চলছে গণহারে মুসলিম নিধন। একই কাতারে সারিবদ্ধ বাতিল পরাশক্তি। উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে পথভ্রষ্ট এক ফিতনাবাজ দল মুসলমানদের ঈমান হরণে লিপ্ত। কুরআন মানার কথা

বলে মানুষকে সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের আহলে কুরআন বলে পরিচয় দিলেও বাস্তবে এরা মুনকিরিনে হাদিস। সুন্দর নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে হীন উদ্দেশ্য। আহলে কুরআনওয়ালারা সরাসরি হাদিস মানে না। অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতে হাদিস মেনে চলা ও নবীজী সা:-এর আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰي ط

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰي لا

‘তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়।’ (সূরা আন-নাজম : ৩-৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ٤٤
‘এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ফিকির করে।’ (সূরা নাহল-৪৪)

ওই আয়াতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাজ হলো মানুষকে কুরআন বুঝিয়ে দেয়া। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখনিঃসৃত বাণীই হচ্ছে হাদিস। যারা হাদিস মানে না তারা মূলত কুরআনই মানে না।
বস্তুত এসব ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণীরই সত্যায়ন। হাদিসের পাতায় যা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। হজরত মিকদাম বিন মাদিকারিব আল কিনদি রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘অচিরেই কোনো ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদিস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও

তোমাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানব এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানব। মহানবী বলেন, সাবধান! নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ।' (ইবনে মাজাহ-১২)

যুগের অগণিত ফিতনার অন্যতম একটি হলো, হাদিস অস্বীকার করা ফিতনা। এই হাদিস অস্বীকারকারীর দল নিজেদের নোংরা নখর বের করে সরাসরি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্ত্বা এবং হাদিসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর কঠিনভাবে আক্রমণ শুরু করেছে। কারণ হাদিস থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরাতে পারলে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানো জলের মতো সোজা। এ কারণে তারা ফেসবুক, ওয়েবসাইট ও ওয়াজ মাহফিল, সভা, ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের এই জঘন্য অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তারা হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলছে। হাদিসের অপব্যাখ্যা করে তার মানহানি করছে। হাদিসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। তারা বলতে চায়, ইসলামের বিধিবিধান মোতাবেক জীবনযাপনের জন্য কেবল কোরআন যথেষ্ট, হাদিস মানার প্রয়োজন নেই। হাদিস বা সুন্নাহ শব্দটি তারা শুনতে চায় না। যার কারণে এরা নিজেদেরকে নাম দিয়েছে 'আহলে কোরআন বা কোরআনের অনুসারী'। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর করা ভবিষ্যদ্বাণী কতো সত্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে আজ। তিনি বলেছেন-'জেনে রাখো! আমি কোরআনপ্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সঙ্গে আরও অনুরূপ আরেকটি জিনিস (তা হলো হাদিস)। অচিরেই দেখা যাবে, এক লোক ভরা পেটে তার খাটের ওপর থেকে বলবে, তোমরা এই কোরআনকে আঁকড়ে ধরো। এতে যে সকল বস্তু হালাল পাবে, সেগুলোকে হালাল মনে করো, আর যেসব বস্তুকে হারাম পাবে, সেগুলোকে হারাম মনে করো।' (আবু দাউদ : ৪৬০৪)। হাদিসটি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কারণ নবুওয়তের যুগ পার হওয়ার পরপরই

শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের হাত ধরে বিভিন্ন দল তৈরি হয়। তারা হাদিসের ওপর আক্রমণ শুরু করে। তারা বলে, 'কোরআনই যথেষ্ট।'

প্রকৃত আহলে কুরআন কারা

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن لله أهلينَ من الناس.

'নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর'আহল' (অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ ব্যক্তি)।'

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন-

يا رسول الله من هم؟

'হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?'

আল্লাহর রাসূল বললেন-

هم أهل القرآن، أهل الله وخاصّته

'তারা আহলুল কুরআন-কুরআনওয়ালা। তারাই আল্লাহর 'আহল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজন।'

-মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২২৭৯; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৭৯৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৫

যারা কুরআন মুখস্থ করে ও অর্থ অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে তারাই মূলতঃ আহলে কুরআন। সুতরাং স্পষ্টত যে, সবচে বড় কুরআনওয়ালা হলেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উপর আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাফসীর শিখিয়েছেন। তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন- তিনি যেন মানুষকে কুরআনের তিলাওয়াত শেখান, কুরআনের অর্থ-

মর্ম ও বিধি-বিধান শেখান, তাদের সামনে কুরআনী জীবনের বাস্তব নমুনা পেশ করেন, কুরআনে নির্দেশিত ইবাদতসমূহের পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ রূপরেখা শেখান এবং তাদেরকে কুরআনী শরীয়ত (যা নবীজীর সুন্নতও বটে) শিক্ষা দেন।

এরপর মানুষের উপর ফরয করেছেন- এই সকল বিষয়ে তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। সঙ্গে কুরআনে এই সাক্ষ্যও দিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কুরআন এবং তাতে নির্দেশিত সিরাতে মুসতাকীমেরই পথ দেখান। কুরআনী নূরের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে হেদায়েত ও ইলমের আলোর দিকে নিয়ে যান।

অতএব খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বপ্রথম ও সবচে বড় 'আহলুল কুরআন' বা কুরআনওয়ালা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আহলুল কুরআন হলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের সর্বপ্রথম তালিবে ইলম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর উপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে মানদণ্ড বানিয়েছেন। যেমন কুরআনের প্রতি ঈমান, কুরআনের 'পাঠ' ও তার তিলাওয়াত, কুরআন অনুধাবন, কুরআনের ব্যাখ্যা, কুরআন অনুযায়ী আমল ইত্যাদি। আর এই মহান আমানতের প্রথম বহনকারী ও প্রথম সাক্ষ্যদানকারী বানিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে। পরবর্তীদেরকে কুরআন হাসিলের ক্ষেত্রে তাঁদের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও শিক্ষা ছেড়ে কুরআনের প্রতি ঈমান আনাই অসম্ভব। আর সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুরআনী যিন্দেগীর উপর রেখে গিয়েছেন সেটাই 'সাবীলুল মুমিনীন'-মুমিনদের পথ।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ " .

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি’ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকাবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য বা নিষেধাজ্ঞা পৌছাবে, তখন সে বলবে, আমি অবহিত নই। আমরা যা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাবো শুধু তারই অনুসরন করব। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৫)

অন্য হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ " .

আল-মিক্বদাম ইবনু মা’দীকারিব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে

যখন কোন প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহন করো, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম মেনে নিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জেনে রাখো! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশুও নয়। অনুরুপ সন্ধিবদ্ধ অমুসলিম গোত্রের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, অবশ্য যদি সে এর মুখাপেক্ষী না হয়। আর যখন কোন লোক কোন সম্প্রদায়ের নিকট আগন্তুক হিসাবে পৌঁছে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার মেহমানদারীর পরিমান জিনিস আদায় করার অধিকার তার আছে।

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৬)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ফিরকা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে বাস্তবে দেখা দেয়। এ সময় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে। ইমাম শাফেঈ এমন একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তির সাথে তার মুনাযারার কথা উল্লেখ করেছেন *(কিতাবুল উম্ম ৭/২৮৭-২৯২)*। সেখানে তিনি তার দাবীর অসারতা প্রমাণ করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ এগারো শত বছর হাদীস অস্বীকারকারীদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মিলেনি। বিগত শতাব্দী তথা ত্রয়োদশ হিজরীতে এই ফিতনার পুনরাবির্ভাব ঘটে মিসর, ইরাক এবং ভারতে (বিস্তারিত দ্রঃ ‘হাদীছের প্রামাণিকতা’ বই)। বর্তমানে বাংলাদেশেও এই ভ্রষ্ট আক্বীদার কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তাই এদের নব্য আহলে কুরআন হিসেবেই চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত।

নব্য আহলে কুরআনের উৎপত্তি ও বর্তমান অবস্থা

ইসলাম ধর্মের নামে নব্য আবিষ্কৃত দলগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তিকর দলটির নাম হল, 'আহলে কুরআন'। সুন্নাত অস্বীকার করার ফিতনা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরী শতকে উত্থিত হয়েছিল। এই ফিতনার সূত্রপাত করেছিল খারিজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়। খারিজীদের এই ফিতনা উত্থাপনের প্রয়োজন এজন্যে হয়েছিল যে, তারা মুসলিম সমাজে যে নৈরাজ্যে ছড়াতে চাচ্ছিল তার পথে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নাহ (হাদীস) প্রতিবন্ধক ছিল যা এই সমাজকে একটি সুশৃংখল ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাদের এ পথে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই সব বাণীও প্রতিবন্ধক ছিল যার বর্তমানে খারিজীদের চরমপন্থী মতবাদ অচল হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তারা হাদীসের যথার্থতায় সন্দেহ পোষণ এবং সুন্নাহর অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করে।

মুতাযিলাদের এই ফিতনার সূত্রপাত করার প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, অনারব ও গ্রীক দর্শনের সাথে প্রথম বারের মত সাক্ষাত হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে যেসব সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে তা পূর্ণরূপে অনুধাবনের পূর্বে তারা কোন না কোনভাবে এর সমাধান দিতে চাচ্ছিল। স্বয়ং এই দর্শনের উপর তাদের এতটা অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়নি যে, তার সমালোচনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তার বিশুদ্ধতা ও শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। দর্শনের নামে যে কথাই এসেছে তারা তাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবী মনে করেছে এবং তারা চাচ্ছিল যে, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও নীতিমালার এমন ব্যাখ্যা করা হোক যাতে তা এই নামমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দাবীর অনুরূপ হয়ে যায়। এ পথেও হাদীস এবং সুন্নাহ্ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তারাও খারিজীদের মত হাদীসকে সন্দেহযুক্ত মনে করে এবং সুন্নাহকে দলীল হিসাবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

বর্তমান যুগের নব্য আহলে কুরআন উৎপত্তির ঘটনাটা বেশ অনেকশত বছর পর। পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শায়খ খাদিম হুসাইন ইলাহী বাখশ (হাফিযাহুল্লাহ) 'উম্মুল কুরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স (M.A) করার সময় 'আহলে কুরআন' সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে তিনি فِرْقَةُ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِبَاكِسْتَانِ وَمَوْقِفُ الْإِسْلَامِ مِنْهَا শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ (Thesis) রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর প্রবন্ধকেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি 'আহলে কুরআনের উৎপত্তি' নামক শিরোনামে বলেছেন,

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে ১৭০০ শতকের শেষের দিক থেকেই হাদীস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অন্তরে সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে ইসলাম ধর্মের নামে অত্যাধিক জঘন্য, বিপদগামী, আদর্শচ্যুত, দিশেহারা, ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক দুইটি দল উদ্ভাবিত ও অভ্যুদিত হয়েছে। যার একটির নাম 'ক্বাদিয়ানী', আর অপরটির নাম 'আহলে কুরআন'। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অভিশপ্ত গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী নিজেকে নাবী বলে দাবী করার মাধ্যমে 'ক্বাদিয়ানী' সম্প্রদায় শিরোনামে আসে। আর ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে একই প্রদেশ থেকে হাদীস অস্বীকারকারী আব্দুল্লাহ চড়কলাবীর প্ররোচনায় 'আহলে কুরআন' নামক অপর একটি ভ্রান্ত দলের উৎপত্তি হয়। যে সাধারণ মানুষদের সুন্নাতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে শুধু কুরআন মানার প্রতি আহ্বান করতে থাকে এবং সে 'লাহোরের জিনিয়ান-ওয়ালী' নামক একটি মাসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। শুরুর দিকে মূলত দু'জন ব্যক্তি-ই এই ভ্রান্ত মতবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। একজন পূর্ব ভারতের বিহার রাজ্যের 'মুহিব্বুল হাক্ব আজীম আবাদী', অপরজন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে পলায়নকারী 'লাহোরের আব্দুল্লাহ চড়কলাবী'।[**আল-কুরআনিয়্যীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২১।**]

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এরা দু’জনেই কিন্তু সাইয়্যিদ আহমাদ খাঁন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ‘ছাওতু আলীকারাহ বা আলীগড়ের ডাক’ নামক আন্দোলনের সময়কালে তিনি বলেছিলেন, ‘দ্বীন মানার জন্য শুধু কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে এবং হাদীসকে শারঈ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না’। এই আহ্বান ‘মুহিব্বুল হাক্ক আযীমাবাদী’ ও আব্দুল্লাহ চড়কলাবীকে’ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল’।[**প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।**]

বর্তমানে ‘আহলে কুরআন’ নামক দলটি চারটি উপদলে বিভক্ত। যথা :

(১) উম্মাতু মুসলিম আহলুয-যিকর ওয়াল কুরআন

(২) উম্মাতুন মুসলিমাতুন

(৩) তুলূঊ ইসলাম এবং

(৪) তাহরীকু তা‘মীর ইসলাম’।[**প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৬৪।**] বাংলাদেশ ভারতে তথা ইন্দোপাকিস্তান অঞ্চলেও এদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ইসলামের নামে যে সমস্ত মাযহাব, দল ও মতবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে তাদের স্বধর্মভ্রষ্টতা, পদস্খলিতা ও অধঃপতনের বিষয়টি পরিস্ফুটিত করার সর্বাধিক সহজবোধ্য ও সহজলব্ধ উপায় হল তার উৎপত্তিকাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত বা তথ্যাভিজ্ঞ হওয়া। কেননা হাদীছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

‘বানী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সব দলগুলোই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত’।[**তিরমিযী, হা/২৬৪১; মিশকাত, তাহক্বীক্ব ছানী, হা/১৬৯, ১৭১; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৩৪৮; ছহীহুল জামি‘, হা/৫৩৪৩।**]

উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, যারাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণের আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে, বিবিধ দলসমূহের মধ্য হতে শুধু তারাই প্রকৃত ইসলামের ও হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর তারাই সফলতা, সার্থকতা এবং পরিত্রাণ পাবে।

নব্য আহলে কুরআন সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতামত

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, 'তারা কাফের এবং ইসলাম হতে খারিজ। তাদের হাশর হবে ইহূদী ও নাছারা বা অন্যান্য ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সাথে'[মিফতাহুল জান্নাহ পৃঃ ৫]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী আহলে কুরআন বা হাদীস অস্বীকারকারীরা কাফির। নিম্নে কয়েকজন বিদ্বানের মতামত উল্লেখ করা হলো :

(১) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধ্বংস অনিবার্য'।[**শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আতি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৮**।]

(২) ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহ্ওয়াইহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন একটি ছহীহ হাদীছ পৌঁছেছে, অতঃপর সে কোন ভয়ের আশঙ্কা ছাড়াই তাকে অস্বীকার করেছে, তবে সে নিশ্চিতরূপে কাফির'।[**ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯, ফৎওয়া নং-১১৫১২৫**।]

(৩) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য নয়, তারা কাফির, তাদের হত্যা করা অপরিহার্য'।[**আল-ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫**।]

(৪) ইমাম সূয়ুত্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা নবী (ﷺ)-এর হাদীছকে অস্বীকার করে তারা কাফির এবং তারা ইসলামের গণ্ডি ও চৌহদ্দি থেকে নিষ্কাষিত হয়ে ইয়াহুদী,

খ্রিষ্টান অথবা অন্য কোন বিধর্মী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে'।[**মিফতাহুল জান্নাহ্ ফিল ইহতিজাজি বিস সুন্নাহ, পৃ. ১৪।**]

(৫) ইমাম ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস প্রমাণিত হওয়ার পরেও যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা স্পষ্ট কাফির'।[**শারহুল ইলমাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮।**]

(৬) ইমাম ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমরা শুধু কুরআনের বিধানই মানব, হাদীছ মানব না, তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির'।[**আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।**]

(৭) শায়খ আবূ বাকর আল-আজুর্রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আলিমগণ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের মধ্যে যে সমস্ত বিধানকে ফরয করেছেন, তার পদ্ধতি ও নিয়ম-কানূন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত ছাড়া উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর যারা এর বিপরীত বলবে, অর্থাৎ যারা বলবে যে, সুন্নাত ছাড়াও ইসলাম মানা সম্ভব তারা কাফির। তারা ইসলামী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে'।[**আশ-শারী'আহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২।**]

(৮) শায়খ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে তারা কাফির ও স্বধর্মত্যাগী। কেননা সুন্নাতকে অস্বীকার করা কুরআনকে অস্বীকার করার নামান্তর। যে কিতাব ও সুন্নাতকে অথবা এর কোন একটিকে অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। অবশ্যই তাকে এ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা

দরকার'।[**মাজমূঊ ফাতাওয়া লিইবনি বায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩ ও ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-১৭৮।**]

(৯) সঊদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি বলেন, 'যারা সুন্নাত অনুযায়ী আমাল করাকে অস্বীকার করে তারা কাফির'।[**ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪ ও ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০।**]

উপরিউক্ত মতামতের পক্ষের দলীল বর্ণনায় নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হল :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي 'সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়'।[**সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৩৫৩৪।**]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى الله 'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তা'আলারই নাফরমানী করল'।[**সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৫৭, ৭১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৫।**]

কুরআন থেকে হাদীসের প্রামাণিকতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা

এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কাউকে পয়গম্বর বা নবী মনোনীত করা হয়, তখন এর দৃষ্টিভঙ্গি, স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কী থাকে? পয়গম্বরের স্থান ও মর্যাদা কি শুধুই একজন পিয়ন বা দূতের মতো, চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই? এবং যিনি শুধু চিঠি পৌছিয়ে দিয়ে নিজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান?

এর জবাব হচ্ছে নিশ্চিত 'না'। আম্বিয়ায়ে কেরামের শুধুমাত্র আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমিত নয়। বরং তাঁদের দায়িত্ব এটাও যে, তাঁরা আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন, নিজে আমল করে এর উপর আমল করার তরিকা বাতলে দিবেন। এবং এমন আমলি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, যা কিতাবুল্লাহর নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তাঁদের নবী-পদমর্যাদার জিম্মাদারি কেবল আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলি পাঠ করার দ্বারাও পূর্ণ হয় না, বরং এর শিক্ষাদান ও এর শিক্ষানুযায়ী জীবন-যাপনের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করা ও এর বাস্তব অনুশীলন করানোও- তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারিমে এক দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে এ- বিষয়ের সকল সন্দেহ-সংশয়ের মূলোৎপাটন করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (আলে ইমরান-১৬৪)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ। তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। (সূরা জুমু'আ, আয়াত ২)

এগুলো ঐ উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও দায়িত্ব, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রদান করার দোয়া করেছিলেন হযরত ইবরাহিম আ.। কুরআনে কারিমে দোয়াটি এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِت وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন; যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন। তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। (সূরা বাকারা-১২৯)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে, নিম্নের চারটি স্পষ্ট ও পৃথক দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোপর্দ করা হয়।

১. আল্লাহর কিতাবের আয়াত পড়ে শোনানো (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ)

২. কিতাবের শিক্ষাদান (يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ)

৩. হেকমতের শিক্ষাদান (وَالْحِكْمَةَ)

৪. তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি (يُزَكِّيهِمْ)

তাইতো প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রাখেনি, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব কেবল এটা নয় যে, তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিবেন; আর মানুষকে ছেড়ে দিবেন তারা যেভাবে ইচ্ছা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে এ যেভাবে ইচ্ছা এর উপর আমল করবে। বরং এর বিপরীতে স্পষ্ট জানি দেওয়া হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কিতাবের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর যেহেতু শুধু কিতাবের শিক্ষাই যথেষ্ট নয় তাই তাঁর দায়িত্বে এটাও অর্পিত যে, তিনি হেকমতের শিক্ষা দিবেন; যা কিতাব ব্যতীত ভিন্ন জিনিস। কেন এগুলোকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং মানুষের তাযকিয়া ও পরিশু করার দায়িত্বও তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এর মর্মার্থ হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ হেকমতের পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি এর আমলি বা প্র্যাকটিকেল দীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ কিতাবুল্লাহ ও হেকমতে শিক্ষার উপর ঐ পদ্ধতি ও পন্থায় আমল করতে পারে, যা আল্লাহ তাআল পছন্দনীয়।

কুরআনে কারিমের উপর্যুক্ত আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিম্নের চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে।

১. কুরআনে পাকের তেলাওয়াত ও পাঠ পদ্ধতির বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাই দলিল।

২. কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যই চূড়ান্ত।

৩. দীনি নির্দেশনার উপর নির্ভরশীল হেকমত শিক্ষার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্ত্বাই একক উৎস।

৪. নিজ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মানুষকে আমলি মশকের (অনুশীলনের) দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অর্পণ করা হয়েছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জরুরি হলো তাঁর সকল শিক্ষা- মৌখিক হোক বা আমলি, অনুসারীদের জন্যে মান্য করা অত্যাবশ্যক হতে হবে। এবং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীক্ষার অধীনস্ত, তাদের জন্য থাকতে হবে তাঁর কথা মানা ও সে অনুসারে আমল করার বাধ্যবাধকতা। উল্লিখিত দায়িত্বের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থাৎ কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদানের আবশ্যকীয় চাহিদা হচ্ছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম ও আদেশ অনুসারীদের জন্য পালন করা ওয়াজিব। তদ্রুপ প্র্যাকটিকেল অনুশীলনের অর্থাৎ চতুর্থ দায়িত্বের তাগাদা হচ্ছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ-কর্ম উম্মতের জন্য একটি উপমা; উম্মত যা অনুসরণের ব্যাপারে আদিষ্ট। এটা কেবল যুক্তিশাস্ত্রের আবিষ্কার নয় যা উল্লিখিত আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বরং এটা কুরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াতের স্পষ্ট বিধান যার অধীনে মুসলমানদের উপর পয়গম্বরদের আনুগত্য ও অনুসরণ অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এই বিধানের ধারাবাহিকতায় কুরআনে কারিম দুইটি ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছে।

১. اطاعت আনুগত্য করা ও মান্য করা।

২. اتباع অনুসরণ করা ও অনুকরণ করা।

প্রথম পরিভাষার সম্পর্ক রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম-আহকাম ও নির্দেশ-উপদেশের সাথে আর দ্বিতীয় পরিভাষার সংশ্লিষ্টতা কাজ-কর্ম আমলের সঙ্গে। তাই কুরআনে কারিম মুসলমানদেরকে اطاعت ও اتباع এর হুকুম দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ উভয়টাকে অকাট্য, অবিকল্প ও আবশ্যকীয় দলিল সাব্যস্ত করেছে।

রাসুলের আনুগত্য

এ কারণেই কুরআনে কারিমে বারংবার পয়গম্বরের আনুগত্য ও অনুসরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩২)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। (সূরা আলে ইমরান- ১৩২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। (সূরা নিসা- আয়াত ৫৯)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। (সূরা মায়েদা- ৯২)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর- যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (সূরা আনফাল- আয়াত ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (সূরা আনফাল- আয়াত ২০)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। (সূরা আনফাল- আয়াত ৪৬)

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۚ وَمَا عَلَي الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

বলুন: আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া। (সূরা নূর-৫৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ- ৩৩)

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ۝

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। (সূরা মুজাদালাহ- ১৩)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۝

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছিয়ে দেওয়া। (সূরা তাগাবুন- আয়াত ১২)

এই আয়াতগুলোর মধ্যে রাসূলের আনুগত্য একটি আবশ্যকীয় বিধানরূপে বর্ণিত হয়েছে। অনেক আয়াত এমনও আছে যেখানে রাসূলের আনুগত্যের ফলাফল ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানেও রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে একত্রিত ও একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। (সূরা নিসা- ১৩)

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন; সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (সূরা নিসা- আয়াত ৬৯)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَي اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ

মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে; তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর- ৫১-৫২)

وَمَن يُطِعُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব-৭১)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী। (সূরা তাওবা- আয়াত ৭১)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। (সূরা হুযুরাত- আয়াত ১৪)

কুরআনে কারিমে একথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, 'রাসূলের আনুগত্য বা ফরমাবরদারি' আল্লাহ তাআলার নতুন কোনো বিধান নয়। এবং এর প্রয়োগ শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং রাসূলের পূর্বে প্রেরিত সকল নবীর বেলায়ও এ মূলনীতি প্রয়োজ্য।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। (সূরা নিসা- আয়াত ৬৪)

কুরআনে কারিম এবিষয়টিও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, সমস্ত রাসূল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মুখপাত্র এবং দূত। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মূলত ও প্রকারান্তরে স্বয়ং আল্লাহরই আনুগত্য।

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله

যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। (সূরা নিসা- আয়াত ৮০)

যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও ফরমাবরদারির উপর কুরআনে কারিম বারবার জোর তাগিদ দিয়েছে; এবং এটাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছে। ঠিক তেমনি রাসূলের নাফরমানি ও বিরুদ্ধাচরণ এবং এর প্রতিফলের ব্যাপারে খবরদার ও সতর্ক করে দিয়েছে। আর রাসূলের নাফরমানিকে আল্লাহর নাফরমানির সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা নিসা- আয়াত ৪)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَي اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۭ
وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব- আয়াত ৩৬)

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা জিন-আয়াত ২৩)

وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুত যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (সূরা আনফাল-আয়াত ১৩)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (সূরা তাওবা- ৬৩)

সুতরাং 'আনুগত্যে'র ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক কুরআনে কারিম আলোচনা করেছে। এবং 'রাসূলের আনুগত্য' তন্মধ্যে প্রত্যেকটি আয়াতে পৃথক কিন্তু 'আল্লাহর আনুগত্যে'র সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, যখনই কুরআনে কারিমে 'আল্লাহর আনুগত্যে'র উল্লেখ হয়েছে; তো তৎক্ষণাৎ এর পরেই 'রাসূলের আনুগত্যে'র নির্দেশও এসেছে। পুরো কুরআনে কারিমে তা-ই হয়েছে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি আয়াতও এমন নেই; যাতে 'আল্লাহর আনুগত্যে'র বর্ণনা হয়েছে কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই 'রাসূলের আনুগত্যে'র উল্লেখ হয়নি।

এর বিপরীতে এমন কিছু আয়াত রয়েছে; যাতে রাসূলের আনুগত্যের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে কিন্তু এর সাথে আল্লাহর আনুগত্যের কথা উল্লেখ নেই। যেমন:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (সূরা নূর- ৫৬)

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। (সূরা নূর-৫৪)

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানি করেছিল, যেন জমিনের সাথে মিশে যায়। (সূরা নিসা-আয়াত ৪২)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব; যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (সূরা নিসা- আয়াত ১১৫)

'রাসূলের আনুগত্য'কে এত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করার কারণ একমাত্র এটাই যে, তা ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য কার্যত সম্ভবই নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে এটা বলা হয় না যে, আল্লাহ তাআলা তার কাছে কী চাচ্ছেন? যেমনটি কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহির মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো দূত প্রেরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ যা চান; সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। (সূরা শুরা- আয়াত ৫১)

সুতরাং আল্লাহ তাআলার একমাত্র ও অমোঘ নিয়ম, তিনি নিজ পয়গাম ও বার্তা পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন। এবং বাস্তবিকক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য রাসূলের আনুগত্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। অতএব, যখনকোনো পয়গম্বর কোনো বিষয়ের অনুমতি দেন; কিংবা নিষেধ করেন, তো তিনি তা নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে করেন না। বরং একজন পয়গম্বর বা নবী হিসেবে এই হুকুম করেন। আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন পরিষ্কারভাবে 'রাসূলের আনুগত্যে'র নির্দেশ দিয়েছেন। তো এখন তা মান্য করা

প্রকারান্তরে ও পরোক্ষভাবে আল্লাহরই আনুগত্য। কুরআনে কারিম এবিষয়টি নিম্নের আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় পরিপূর্ণ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। (সূরা নিসা- আয়াত ৮০)

সুতরাং কুরআনে কারিমে যেখানেই 'রাসূলের আনুগত্যে'র উল্লেখ হয়েছে; সেখানে বলা ছাড়াই তা আল্লাহর হুকুম বলে গণ্য হবে। কেননা, পয়গম্বর স্বীয় পয়গম্বরি দৃষ্টিকোণের কোনো কথা আসমানি ওহি ব্যতীত বলতে পারেন না।

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

কুরআন ওহি; যা প্রত্যাদেশ হয়। (নাজম- ৩-৪)

এ-হিসেবে দেখলে তো 'রাসূলের আনুগত্য' আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য অবশ্যই শামিল। একারণেই কুরআনে কারিম কয়েক স্থানে শুধু রাসূলের আনুগত্য যথেষ্ট মনে করে আল্লাহর আনুগত্যের আলোচনা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব পদ্ধতি কেবল রাসূলের আনুগত্য।

এর উল্টো কুরআনে কারিমে শুধু 'আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে'র উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। এবং এর সাথে রাসূলের আনুগত্যের আলোচনা অবশ্যম্ভাবীরূপে করা হয়েছে। যাতে রাসূলের আনুগত্যকে ছেড়ে দিয়ে কোনো মামুলি আপত্তিকেও নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছে। আর এব্যাপারে যেন দুর্বল থেকে দুর্বলতম কোনো সন্দেহ বাকি না থাকে যে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য সেসময় পর্যন্ত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না; যতক্ষণ না সকল আনুসঙ্গিক বিষয়সহ রাসূলের আনুগত্যকে গ্রহণ করা হয়।

রাসূলের অনুসরণ

এ-ব্যাপারে কুরআনে কারিমের দ্বিতীয় পরিভাষা হচ্ছে 'ইত্তেবা'। যার অর্থ, অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। (সূরা আলে ইমরান- আয়াত ৩১)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

সেসমস্ত লোক; যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসূলের, যিনি উম্মি নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায় (সূরা আরাফ- আয়াত ১৫৭)

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্ উপর; তাঁর প্রেরিত উম্মি নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর; যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আরাফ- আয়াত ১৫৮)

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি; যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (সূরা তাওবা- আয়াত ১১৭)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবী! আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা আনফাল- আয়াত ৬৪)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (আলে ইমরান- ৫৩)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দিই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। (সূরা ইউসুফ- আয়াত ১০৮)

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَاالنَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

নিশ্চয় মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। (আল ইমরান-৬৮)

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। (হাদিদ- ৫৭)

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓي اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۭ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ

আর তুমি মানুষদেরকে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে। অতঃপর তখন যারা যুলম করেছে তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব’। ইতঃপূর্বে তোমরা কি কসম করনি যে, তোমাদের কোন পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪৪)

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। (সূরা বাকারা- আয়াত ১৪৩)

قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। (সূরা ইয়াসিন- আয়াত ২০)

قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। (সূরা ইয়াসিন- আয়াত ২০)

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (সূরা তোয়া হা- আয়াত ৯০)

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

তারা বলেছিল: আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব। (সূরা কামার- আয়াত ৫৪)

এ-সমস্ত আয়াত বিভিন্ন আন্দায ও হরেক পন্থায় রাসূলের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছে এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে, যে কোনো পয়গম্বরের উপর ঈমানদার ব্যক্তি তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে আদিষ্ট ও নির্দেশপ্রাপ্ত। এর কারণ একবোরেই স্পষ্ট, পয়গম্বরদের আ. একারণে প্রেরণ করা হয়েছে যে, তাঁরা মানুষদের জন্য স্বীয় তালিম ও তাবলিগ অনুযায়ী জীবনাতিপাত করার একটি আমলি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তাঁদের পয়গাম ও বার্তা শুধু মৌখিক কথাসর্বস্ব শিক্ষা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁদের কীর্তি, কর্মপদ্ধতি এবং জীবনের পন্থা ও পদ্ধতিও হেদায়াতের রাস্তা বুঝা ও এর উপর আমল করার জন্য সমান গুরুত্ব রাখে।

কুরআনে কারিমের সূরায়ে আহজাবে এবিষয়টি পরিষ্কারভাবে বিধৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা আহযাব- আয়াত ২১)

এটি একটি প্রমাণিত বাস্তবতা যে, কেবল পুঁথিগত ও শাস্ত্রীয় শিক্ষা কোনো জাতির সংশোধনের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সংশোধনের প্রাকৃতিক পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষজনের সামনে একটি আমলি ও বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করা হবে, যার অনুসরণ তারা করতে পারে। তদ্রুপ শুধু পুঁথিগত শিক্ষা কাউকে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বানাতে পারে না; যতক্ষণ এর পাশাপাশি ঐ জ্ঞান বা বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে দীক্ষা গ্রহণ না করবে।

উদাহরণস্বরূপ কেউ চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রহণ করেছে কিন্তু সে কোনো পারদর্শী অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে ইন্টার্নি করে নি, তাহলে বই-পুস্তকের অগাধ অধ্যয়ন থাকা সত্ত্বেও সে ডাক্তারি সেবা করতে পারবে না এবং এমন ডাক্তারদের রোগীদের জীবন নিয়ে খেলা করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

যদি কোনো আইনের ছাত্র হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো অভিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবির নিকট হতে আইন কাজ-কর্মের অনুশীলন না করে এবং একটা উল্লেখযোগ্য সময় তার অধীনে না কাটায় তবে আইনবিদ বা আইনজীবি হওয়ার দাবি করতে পারে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের কথা তো ভিন্ন। একজন সাধারণ ব্যক্তি যার ভালো খাবার পাকানোর আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, তবে সে শুধু এবিষয়ে বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়ে সুস্বাদু খানা পাকাতে পারবে না। অথচ খানা পাকানোর প্রয়োজনীয় উপাদান, পদ্ধতি এবং অতি সাধারণ কথাও বই- পুস্তকে স্পষ্ট ও বিশদভাবে উল্লেখ থাকে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কখনো খানা পাকায়নি; সে শুধু বই পড়ে উৎকৃষ্ট ও ও সুস্বাদু খাবার রান্না করতে

পারবে না। যদি না সে কোনো অভিজ্ঞ পাচকের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন না করে। সে অভিজ্ঞ পাচক তাকে বাস্তবে খাবার রান্না করে দেখায় আর এ ব্যক্তি তা পুনর্বার করতে করতে ধীরে ধীরে সুস্বাদু খাবার রান্না করা শিখে যায়।

এর দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয়, মানুষের সত্ত্বা কোনো বিষয় শেখার জন্য সর্বদা বাস্তব অনুশীলনের প্রয়োজন বোধ করে। এবং অন্যান্য বিষয়ের মতো ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্যও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

একারণেই আল্লাহ তাআলা শুধু আসমানি কিতাব নাযিল করেই ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা আসমানি কিতাবের সঙ্গে কোনো নবী বা পয়গম্বর অবশ্যই প্রেরণ করেছেন। এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কোনো পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু তার সাথে কোনো কিতাব আসে নি। কিন্তু এমন একটি আসমানি কিতাবও নেই যা কোনো পয়গম্বর ব্যতীতই অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার কাফেরগণও কয়েকবার এ আবেদন করেছে যে, নবীয়ে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতা ব্যতীত সরাসরি তাদের উপর কিতাব নাযিল করা হোক। কিন্তু এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এবং কিতাব-কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। এর কারণ একবোরেই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। মানবতার শুধু একটি কিতাবেরই প্রয়োজন ছিল না বরং একজন শিক্ষকেরও প্রয়োজন ছিল। যিনি কিতাবের বিষয়বস্তু শিক্ষাও দিতে পারেন। মানবতার একজন দীক্ষাগুরুরও দরকার ছিল যে মানুষকে দীক্ষা দিবে, এবং যিনি তাদের জন্য এমন একটি আমলি উত্তম নমুনা ও আদর্শ স্থাপন করবেন; যা ব্যতিরেকে মানবতা স্বীয় আমলি জিন্দেগিতে সরাসরি ঐ কিতাব হতে উপকৃত হতে পারে না।

এজন্যই রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের প্রতি স্পষ্ট হেদায়াত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের পাবন্দ। এবং মানুষের ঐশী বিধানের ব্যাখ্যা ঐ আমলি উপমা থেকে গ্রহণ করা দরকার; যা রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে একথা স্পষ্ট বিধৃত হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য মূলত

আল্লাহরই আনুগত্য। আর আল্লার আনুগত্য বাস্তবায়নের আমলি তরিকা কেবল এটাই যে, রাসূলের আনুগত্য করা হবে। কেননা, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা নবী হিসেবে যে উপদেশ দিয়েছেন বা কর্ম সম্পাদন করেছেন; তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রাপ্ত ওহির উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ উভয়টি যদিও তা কুরআনে উল্লেখ না থাকুক তবুও তার ভিত্তি খোদা তাআলার ওহির উপর বা তা ওহি দ্বারা সমর্থিত।

হাদীস আল্লাহর ওহি

উপর্যুক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহি ভিন্ন দুই প্রকারে বিভক্ত।

ওহির প্রথম প্রকার ওহি মাতলু:

'ওহি মাতলু' ওহির ঐ প্রকার যা কুরআনে কারিমের আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামি পরিভাষায় তাকে (وحي متلو) তেলাওয়াতকৃত ওহি বলে। অর্থাৎ ঐ ওহি যা নামাযে তেলাওয়াত করা হয়। ওহির এপ্রকার শুধু কুরআনে কারিমের আয়াত সংবলিত। এবং তা কুরআনে কারিমে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত রয়েছে।

ওহির দ্বিতীয় প্রকার -(وحي غير متلو) ওহি গায়রে মাতলু।

'ওহি গায়রে মাতলু' ওহির ঐপ্রকার যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সময়ে সময়ে দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নির্ধারণে নাযিল হয়েছে। এপ্রকার ওহির মাধ্যমে কুরআনে বিধৃত মূলনীতির ব্যাখ্যা এবং বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়। ওহির এপ্রকারকে 'ওহি গায়রে মাতলু' (তেলাওয়াত করা হয় না এমন ওহি)

বলে। ওহির এপ্রকার মানুষের কাছে শব্দে শব্দে পৌঁছানো হয় নি। বরং এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশমালা ও কাজকর্মের রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার ওহির প্রামাণ্যতা কুরআন থেকে

যদিও ওহির এ প্রকার কুরআনে কারিমের অন্তর্ভুক্ত না। তবুও কুরআনে কারিম শুধু এর উদ্ধৃতিই দেয় না; বরং এর বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্টতাও আল্লাহর দিকেই করে। নিম্নের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহর ওহি কেবল কুরআন দ্বারাই পরিসমাপ্তি ঘটে না। বরং ওহির ভিন্ন আরেকটি প্রকার রয়েছে; কুরআনের অংশ না হয়েও তা আল্লাহর ওহি। যেমন: ১.

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه

আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। (সূরা বাকারা- আয়াত ১৪৩)

এই আয়াত বুঝার জন্য এর প্রেক্ষাপট ও শানে নুযুল বুঝা জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর মাদানি জীবনের সূচনালগ্নের কথা। মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রুখ করে নামায পড়ে। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। সতের মাস পর কুরআনে কারিম পূর্বের এবিধানকে রহিত করে দেয়। এবং মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়; তারা যেন মসজিদে হারামকে নিজেদের কেবলা বানায় এবং ঐদিকে ফিরে নামায পড়ে। নতুন এ কেবলা নির্ধারণে নিম্নোক্তে আয়াত নাযিল হয়।

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

এখন আপনি মুসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন। (সূরা বাকারা- আয়াত ১৪৪)।

নতুন এ বিধানের প্রতি কতিপয় মুনাফেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল যে, তাহলে ইতোপূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণে কী হিকমত ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপরের ১৪৩ নং আয়াত নাযিল হয়। যার মধ্যে এ উত্তর দেওয়া হয়েছে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণকরণে লোকদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা কি নবীর অনুসরণ করে না-কি করে না। এখন এই আয়াতকে দ্বিতীয়বার পড়ুন। "আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়।”

এখানে পূর্বে নির্ধারিত কেবলার হুকুমকে স্বয়ং আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাসকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার হুকুমে কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এবার আপনি কুরআনে কারিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। এ হুকুমের কথা কোথাও পাবেন না। একটি আয়াতও মিলবে না; যাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রুখ করার হুকুম বিদ্যমান। বাস্তব কথা হচ্ছে, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি ব্যতীত নিজেই এই হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনে কারিমে এটাকে আল্লাহর হুকুম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই আয়াতের মধ্যে একথা বলা হয় নি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য নির্ধারণ করেছিলেন। বরং এভাবে বলা হয়েছে 'আমরা কেবলা এজন্য নির্ধারণ করেছিলাম.....।

এটা এত স্পষ্ট প্রমাণ যে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কুরআনে কারিমের এ বর্ণনা প্রমাণ করে, পূর্বের হুকুম যা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তি এমন ওহির উপর; যা কুরআনের অংশ নয়। আর এটাই ওহি গায়রে মাতলুর মর্মার্থ। উল্লিখিত ১৪৩নং আয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত রহস্য ও তথ্য প্রমাণিত হয়।

১. নবীয়ে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন ওহি নাযিল হত যা কুরআনে কারিমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. এই ওহি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এসেছিল। এমনকি এ ওহির উপর নির্ভরশীল সমস্ত আহকামও আল্লাহ তাআলার আহকাম বলে গণ্য।

৩. এই আহকাম মুসলমানদের জন্য আমল করা তেমনি ওয়াজিব; যেমন ওহির প্রথম প্রকার অর্থাৎ কুরআনের আহকাম পালন করা ওয়াজিব।

৪. অনেক সময় এসব আহকামের উদ্দেশ্য হত মুসলমানদেরকে পরখ করা। তারা কি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকামের অনুসরণ করে না করে না। চাই তা কুরআনে কারিমে উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক।

২. ইসলামের প্রাথমিক কালে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল- যার অনুসরণ তারা করত, যদি কোনো মুসলমান রোযার সময় ইফতার করে অল্প কিছুক্ষণের জন্যও ঘুমিয়ে যায়; তবে তার জন্য ঐ রাতের পুরো সময় স্ত্রীসহবাস হারাম। সুতরাং কেউ যদি ইফতারের পর সামান্য সময়ের জন্যেও শুয়ে পুনরায় উঠে যেত, তাহলে রাতের বাকি অংশে সে স্ত্রী সহবাস করতে পারত না। অথচ সেসময় তো রোযার অবস্থায় নয়। এই হুকুম জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে ছিল; কুরআনের কোথাও এর উল্লেখ নেই। ঘটনাচক্রে একবার কতিপয় মুসলমানের দ্বারা এ বিধান লঙ্ঘিত হয়ে যায়। তারা ইফতার করার পর ঘুমিয়ে পড়ে; রাতে ওঠে স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করে ফেলে। এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রথমে কুরআনে সেসব লোকের নিন্দা ও তিরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ভবিষ্যতের জন্য এ বিধান রহিত করে মুসলমানদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় যে, ইফতারের পর রাতের যে কোনো অংশে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে; যদিও ইফতারের পর শুয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুর যোগসূত্র ধরে কুরআনে কারিমের ইরশাদ লক্ষ্য করুন-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰي نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَي الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۝

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর; ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। (সূরা বাকারা- আয়াত ১৮৭)

এই আয়াতের সংশ্লিষ্টতায় সূক্ষ্ম বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

* এই আয়াত ঐ কথার সত্যায়ন করে যে, তা নাযিলের পূর্বে রমজানের রাতে (উল্লিখিত শর্তের সাথে) স্ত্রীসহবাস হারাম ও নিষিদ্ধ ছিল।

* এই আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা এ হুকুমের লঙ্ঘন করেছিল, তাদের একাজের নিন্দা করতে গিয়ে বলা হয়- 'তোমরা নিজেদের ব্যাপারে খেয়ানত করতেছিলে'।

* এই বাক্য প্রমাণ করে, তাদের সহবাস করাটা গোনাহ ও পাপ ছিল। কেননা, 'ক্ষমা' ও 'মাফে'র প্রশ্ন তখনি দেখা দেয়; যখন পাপ ও গোনাহের কাজ ঘটে।

* 'এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর' এ বাক্য প্রমাণ করে, রমজানের রাতে উল্লিখিত শর্ত ব্যতীত সহবাস করা কেবল এখন থেকে বৈধ করা হয়েছে।

এসব রহস্য ও তত্ত্ব স্পষ্ট করে জানান দিচ্ছে, এই আয়াত নাযিলের পূর্বে রমজানের রাতে উল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রীসহবাস হারাম ছিল। এ হারাম ও নিষেধ কোনো মান্যবর সত্ত্বার পক্ষ হতে ছিল; এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য তা পালন করা জরুরি ছিল।

কিন্তু কুরআনে কারিমের এমন একটি আয়াতও নেই; যাতে এ নিষেধের আলোচনা রয়েছে। মূলত এ নিষেধ ও পাবন্দি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোপ করেছিলেন। অতঃপর কুরআনে কারিম শুধু সেটার সমর্থন করে নি; বরং তা এমনভাবে বর্ণনা করেছে যে, মনে হয় স্বয়ং কুরআন এ পাবন্দি আরোপ করেছে। তার কারণ, এ হুকুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী দেন নি। বরং তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন ওহির উপর ভিত্তি করে দিয়েছিলেন, যা কুরআনে কারিমে উল্লেখ নেই। তেমনি যদি দেখা যায় তবে এ আয়াত একদিকে প্রমাণ করছে যে, ওহির এমনও একপ্রকার আছে যা কুরআনে কারিমের অংশ নয়। অন্যদিকে এই আয়াত রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন (شارع)আইনপ্রণেতা এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এবং একথা স্পষ্ট করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় তা সবই মান্য করা ওয়াজিব ও অত্যাবশ্যক।

৩. ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরআনে কারিমের কয়েকটি আয়াত এ উদ্দেশে নাযিল হয়, মুসলমানদেরকে বদর যুদ্ধের ঘটনা ও অবস্থা আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, কিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্যের যে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তার বাস্তবায়নও অবতরণ করেন। নিম্নে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ - بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ

هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ - وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

(১২৩) বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।

(১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন।

(১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।

(১২৬) বস্তুত এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধু পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে। (সূরা আলে ইমরান- আয়াত ১২৩-১২৬)

এই স্পষ্ট অনুবাদের প্রতি তাকিয়ে চিন্তা করুন। এখানে ফেরেশতাদের গায়েবি সাহায্যের সুসংবাদকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। যার মর্ম, সাহায্যের সুসংবাদ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রদত্ত সুসংবাদ কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। অন্য ভাষায়, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে অবতীর্ণ এমন একটি আয়াতও নেই যাতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্যের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের উল্লিখিত ১২২-১২৬ নং আয়াতে শুধু এ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, এমন এক সুসংবাদ বদর যুদ্ধের সময় দেওয়া হয়েছিল। এবং প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ রয়েছে, মুসলমানদেরকে এ সুসংবাদ রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এর সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে।

সুতরাং এটি আরেকটি দৃষ্টান্ত। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদকে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বিষয়ের এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ সুসংবাদের বিষয়ে এমন বিশেষ প্রকারের ওহি নাযিল হয়েছিল; যা কুরআনে কারিমের শামিল নয়। আর তাই হচ্ছে 'ওহি গায়রে মাতলু।'

৪. অন্য একস্থানে বদর যুদ্ধের সংশ্লিষ্টতায় কুরআনে কারিমে ইরশাদ-

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে। (সূরা আনফাল- আয়াত ৭)

এই আয়াতের মধ্যে দুই দলের মধ্যে একদল দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যবসায়িক কাফেলা যা শাম থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে আসছিল। আর দ্বিতীয় দল দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদের সৈন্যদল; যা আবু জাহেলের অধিনায়কত্বে রওয়ানা করেছিল। এই আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তাদেরকে ঐ দুই দলের মধ্য হতে যে কোনো একদলের উপর বিজয় দিবেন। এ প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন আবু জাহেলের বাহিনীর উপর বদর প্রান্তরে বিজয়ের মাধ্যমে হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন 'উভয় দল থেকে যে কোনো একদলের উপর বিজয় দান করবেন তা কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। মুসলমানদেরকে একথার সুসংবাদ স্বয়ং রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের কোনো আয়াতের হাওয়ালা ব্যতীত নিজেই দিয়েছেন। তবুও উপর্যুক্ত আয়াতে প্রদত্ত সুসংবাদকে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

এর থেকে কেবল একটি ফলাফল লাভ করা যায়, আর তা হচ্ছে এই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওহি গায়রে মাতলু'র মাধ্যমেই জেনেছিলেন। সুতরাং এ আয়াত ওহির ভিন্ন একটি প্রকার সাব্যস্তকরণের আরেকটি দলিল। এবং তা ওহির ঐ প্রকার যা আমরা পেছনে পড়ে এসেছি যে, তা কুরআনে কারিমের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তােেক 'ওহি গায়রে মাতলু' বলে।

৫. একবার রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য হতে একজনকে একটি গোপন কথা বললেন। তিনি এ গোপন কথা অন্যের কাছে ফাঁস করে দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানলেন গোপন কথা প্রকাশ হয়ে গেছে, তখন তিনি সেই স্ত্রী মুহতারামার কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি উল্টো রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, এ গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ার সংবাদ আপনাকে কে দিয়েছে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে অবগতি দান করেছেন। এই ঘটনা কুরআনে কারিমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন: কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (সূরা তাহরিম-আয়াত ৩)

উপরে বিধৃত এই ষোলটি আয়াত, যা শুধু ওহি গায়রে মাতলুর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে না, বরং এর দ্বারা তার প্রামাণ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং তা মেনে নেওযার আবশ্যকীয়তাও বুঝে আসে। এখানে কুরআনে বিদ্যমান সেসব দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য নয় যাতে ওহির এ প্রমাণের সত্যতা রয়েছে। বরং এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণ পেশ করার ইচ্ছা ছিল। আশা করি, তা উত্তম পন্থায় পূর্ণ হয়েছে। এখন

আলোচনা সামনে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে এই পূর্ণ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় এবং কুরআনের আলোকে তার সারাংশ বুঝে নিলে উপকার হবে।

১. অন্যান্য নবীদের মতো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতি দায়িত্ব শুধু আসমানি কিতাব পৌঁছিয়ে দেওয়াই নয়। বরং সে কিতাবের শিক্ষাদান, হেকমত শিখানো এবং মানুষদেরকে আমলি দীক্ষা দিয়ে তাদের পাক-পবিত্র করাও (তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধিকরণ) তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

২. আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মতোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আবশ্যকীয় ও জরুরি। কেননা, কুরআনে আল্লাহর অনুসরণের সাথে সাথে রাসূলের অনুসরণের কথাও বলা হয়েছে।

৩. রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মূলত আমলিভাবে আল্লাহরই আনুগত্য। কারণ, আল্লাহর আনুগত্য রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

৪. মুসলমানদের উপর শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই জরুরি নয় বরং তাঁর অনুসরণ করাও জরুরি ও আবশ্যক।

৫. নবী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের ভিত্তি হয়তো প্রথমেই ওহির উপর হত অথবা পরবর্তীতে তা হতো ওহি দ্বারা সমর্থিত।

৬. কখনো কখনো এ ওহি অবতীর্ণ হয় কুরআন নিয়ে, তাকে ওহি মাতলু বলে। আর অনেক সময় কুরআন ব্যতীত অন্য এক ওহি অবতীর্ণ হত, আর তা 'ওহি গায়রে মাতলু।'

আইনপ্রণেতা হিসেবে পয়গম্বরের স্বাধীনতা

কুরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিধান রচনা বা আইনপ্রণয়নের স্বাধীনতা দিয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(157)

আর আমার রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে নিয়েছে। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসূলের, যিনি উম্মি নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নুরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। (আরাফ- ১৫৬-১৫৭)

অনুবাদের স্পষ্ট শব্দমালা প্রমাণ করছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্বের মধ্যে এটাও রয়েছে, ভালো ও উৎকৃষ্ট বস্তুকে জায়েয এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট বস্তুকে নাজায়েয সাব্যস্ত করা। এই দায়িত্ব আমর বিল মারুফ- নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ) হতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কেননা, এই কাজের সম্পর্ক ঐ বিষয়ের প্রচার কিংবা বারণ করা; যা পূর্ব থেকেই সৎ বা অসৎ বলে আখ্যায়িত। আর প্রথমোক্ত বিষয়ের সম্পর্ক জায়েয- নাজায়েযের আইন প্রণয়ন করার সাথে। অন্য ভাষায়, এমন নতুন বিধান প্রয়োগের সাথে, যার মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের অনুমতি কিংবা নিষেধের হুকুম দেওয়া হয়েছে। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এখানে নতুন ধর্মীয় বিধান ও আইন প্রণয়নের সম্পর্ক কুরআনের সঙ্গে নয়। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। সুতরাং একথার বিপক্ষে এই বলে দলিল পেশ করা যাবে না যে, আইনপ্রণেতা বানানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনে কারিমে বিধৃত আইনসমূহের ঘোষণা দেওয়া। কেননা, আইন প্রণয়ন আইন ঘোষণা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তাছাড়া জারিকৃত আইনের ঘোষণার কথা পূর্বেই পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং কাজের পরবর্তী অংশ নিশ্চিতভাবে নতুন আইন রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ আয়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান রাখার কথাও জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের পারিপার্শ্বিকতার দিকে লক্ষ্য করে এর স্পষ্ট মর্ম হচ্ছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দায়িত্ব ও স্বাধীনতার কথা আয়াতে বিধৃত হয়েছে, সবগুলোর উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। আর সে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের মধ্যে কোনো বস্তুর বৈধতা এবং অবৈধতা নির্ণয় করাও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আয়াতের মধ্যে ঐ নুরের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাযিল হয়েছে। এখানে কুরাআনে কারিমের অনুসরণের পরিবর্তে নুরের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে তা ঐসব বিধি-বিধানের শামিল করে নেয় যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে। চাই তা কুরআন মাজিদের মাধ্যমে অথবা ওহি গায়রে মাতলু অবলম্বনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের রূপে প্রকাশ পেয়েছে। মোটকথা, যেকোনো দৃষ্টিকোণ

থেকেই দেখা হোক, এই আয়াত এই বাস্তবতার প্রমাণ দিচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনে বর্ণিত আইন ব্যতীত অন্যান্য আইন বানানোরও (বাহ্যত তা ওহি গায়রে মাতলুর উপর ভিত্তি করে হয়েছিল) স্বাধীনতা ও ইচ্ছা অর্পণ করা হয়।

২. কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না। (সূরা তাওবা- আয়াত ২৯)

তরজমার সুস্পষ্ট শব্দমালা জোর দিয়ে এই কথা বর্ণনা করছে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজায়েয ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন, সেসব বস্তু নাজায়েয ও অবৈধ বলেই মানতে হবে। তাছাড়া কোনো বস্তুকে অবৈধ ও নাজায়েয সাব্যস্ত করার এখতিয়ার আল্লাহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশে সে এখতিয়ার ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখতিয়ারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সম্পূর্ণ, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, অমুখাপেক্ষী ও স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখতিয়ার আল্লাহর ওহির উপর সীমাবদ্ধ ও তাঁর থেকে গৃহীত। কিন্তু এই বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা আপন স্থানে অনড় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বাকে এ এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারীদের জন্য জরুরি হচ্ছে, আল্লাহর মূল ক্ষমতার পাশাপাশি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত স্বাধীনতার সামনেও মস্তক অবনত করা।

৩. কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের ফয়সালাকে মুসলমানদের জন্য অবশ্যপালনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে একথা বলা অসামাঞ্জস্য হবে না যে, আয়াতের মূল আরবি শব্দে আল্লাহ ও রাসূল এর মাঝখানে 'ওয়াও' (,) অক্ষর আনা হয়েছে। যা পূর্বাপরের সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতা উভয় অর্থের ধারক। 'ওয়াও' দ্বারা এখানে শুধু সংযোগের অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না। কেননা, এ অবস্থায় আল্লাহর ফয়সালা ঐসময় পর্যন্ত আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যতক্ষণ না পয়গম্বরের ফয়সালা তার সাথে থাকে। অর্থাৎ পয়গম্বরের ফয়সালা ব্যতীত শুধু আল্লাহর ফয়সালা মান্য করা আবশ্যক হবে না। এবং এ আয়াতের এমন অর্থ হবে যা আল্লাহর কালামের মধ্যে কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এ আয়াতের যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা শুধু এটাই যে, ওয়াও অক্ষর দ্বারা সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতা উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে।

তাই আয়াতের অর্থ হবে, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উভয়ে অথবা একজন কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেয়; তবে মুসলমানদের জন্য সে ফয়সালা মান্য করা ব্যতীত কোনো বিকল্প নেই।

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার আইনগত এখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে। আর মুসলমানদের জন্যেও সে ফয়সালা মেনে নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

৪. কুরআনে কারিমের ইরশাদ-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর-আয়াত ৭)

যদিও এ আয়াতের সংশ্লিষ্টতা যুদ্ধের পর মালে গনিমত বণ্টনের সাথে। কিন্তু কুরআনের তাফসিরের স্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে, কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াতের শব্দাবলি যদি ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট না হয় বরং ব্যাপক হয়। তবে সে আয়াতের ব্যাপক ও সাধারণ অর্থ গৃহীত হবে। এবং সে আয়াতের প্রয়োগ ও পরিব্যাপ্তি শুধু ঐ ঘটনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। সর্বদা এ সম্মিলিত ও স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে এ আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে একটি ব্যাপক নীতি নির্ধারণ করছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে যা ফয়সালা দিবেন তা তাঁর অনুসারীদের মান্য করা জরুরি। এবং যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করবেন, তা হতে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এভাবে কুরআনে কারিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালা করা, আইন প্রণয়ন করা এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করার আইনগত এখতিয়ার ও স্বাধীনতা অর্পণ করেছে।

এখানে রাসূলের প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরের উল্লেখ চিত্তাকর্ষক হবে। যা তিনি একজন মহিলার প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করেছিলেন।

আরবের কবিলায়ে আসাদের একজন নারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর দরবারে আগমন করলেন। এবং বললেন, আমি শুনেছি আপনি ওমুক ওমুক বিষয় হতে নিষেধ করে থাকেন। অথচ আমি আল্লাহ তাআলার পুরো কিতাব পড়ে ফেলেছি, কোথাও তো সে বিষয়ে নিষেধ উল্লেখ নেই।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. উত্তর দিলেন, যদি তুমি আল্লাহর কিতাব পড়তে তবে অবশ্যই সে নিষেধ পেয়ে যেতে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

(রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।)

এই উত্তরের মাধ্যমে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই আয়াত এতো ব্যাপক যে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সমস্ত আহকাম ও নিষেধের ফয়সালাকে বেষ্টনকারী। আর যেহেতু আলোচিত বিষয়গুলোর নিষেধ স্বয়ং রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে জারিকৃত। তাই পরোক্ষভাবে তা এই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

৫. তদ্রুপ কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসা- আয়াত ৬৫)

বাহ্যত এই আয়াতের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখতিয়ার একজন ইনসাফকারী ও বিচারপতির এখতিয়ার হিসেবে উল্লেখ হয়েছে যে, কেবল তার সামনে উত্থাপিত বিষয়ের ফয়সালা করতে পারবেন। কিন্তু আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগঠনের উপর একটু চিন্তা করলেই স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে যায়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখতিয়ার শুধু একজন বিচারপতি ও ইনসাফকারীর এখতিয়ার হতে বহু ঊর্ধ্বে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন জজ বা বিচারপতি ও ইনসাফকারীর

এখতিয়ার রয়েছে, সে স্বীয় বিচক্ষণতা অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে। আর বাদী-বিবাদীদের উপর সে ফয়সালা মানতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু সে ফয়সালাকে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া কোনো মুসলমানের আবশ্যকীয় শর্ত নয়। যদি কোনো ব্যক্তি স্বাধীন বিচারকের ফয়সালাকে কবুল না করে; তবে তা ভুল ও অসৌজন্যমূলক আচরণ বলা যায়। এটা তার অপরাধও বটে; যে অপরপাধের শাস্তি তাকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিচারক বা ইনসাফকারীর সিদ্ধান্ত না মানার অপরাধে সে কোনোক্রমেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যেতে পারে না। এর শাস্তিস্বরূপ তাকে কাফের সাব্যস্ত করা যায় না।

এর বিপরীতে এই আয়াত অত্যন্ত কঠোরভাবে তাগিদ দিচ্ছে, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে; তাকে মুসলমান বলা যায় না। এআয়াতের শক্তিশালী বাচনভঙ্গি প্রমাণ করছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমতা কেবল একজন ইনসাফকারী ও বিচারপতির ক্ষমতার সদৃশ নয়। বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করার নামান্তর। এর ফলাফল হচ্ছে, কোনো মোকাদ্দমার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সাধারণ আদালতের সিদ্ধান্ত হতে অনেক ভিন্ন। তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জারিকৃত ঐ আইন-কানুন যা ওহি মাতলু বা ওহি গায়রে মাতলুর ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং এসব আইন-কানুন অস্বীকার করা মূলত আল্লাহর আইন-কানুনেরই অস্বীকার। আর তা অস্বীকারকারী উম্মতে মুসলিমা হতে বহিষ্কৃত।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে উপর্যুক্ত আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু একজন বিচারকের এখতিয়ারই অর্পণ করে না; বরং তাঁকে এমন আইনপ্রণেতার আসনে বসায়, যার ফয়সালা মুসলমানদের জন্য আসমানি ফয়সালার মতোই মান্য করা অত্যাবশ্যক।

৬. কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ؕ - اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

৪৭) তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়।

৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও

রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।

৫০) তাদের অন্তরে কি রোগ আছে; না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী।

৫১) মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।

৫২) আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর, আয়াত ৪৭-৫২)

এআয়াতগুলোও ঘোষণা করছে, মুসলমান হওয়ার আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের সামনে মস্তক অবনত করা। সেসব লোক 'যাদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আহ্বান করা সত্ত্বেও নিজেদের ঝগড়া- বিবাদের মীমাংসার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে না'- কুরআনে কারিমের দৃষ্টিতে তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা যাবে না। এই আয়াতের মর্মও পূর্বের আয়াতের মর্ম হতে ভিন্ন নয়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখার বুনিয়াদি অংশ হল, রাসূলের প্রামাণ্যতা এবং তাঁর এখতিয়ার-স্বাধীনতা মনের গহীন থেকে গ্রহণ করে নেওয়া। ঝগড়া-বিবাদের সময় তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা। তাঁর ফয়সালার পূর্ণ আনুগত্য ও ফয়সালার সর্বদিক আবশ্যিকরূপে অনুসরণ করা।

আহলে কুরআনদের ভ্রান্তি নিরসন

তাদের প্রধানতম কিছু যুক্তি-

১. নবীজী সা. কর্তৃক হাদিস লেখার নিষেধাজ্ঞা

২. কুরআন সব কিছুই বর্ণনা করা হয়েছে

৩.হাদীস বিকৃত কিন্তু কুরআন অবিকৃত

যুক্তিঃ রাসূল সা. কর্তৃক হাদীস লিখতে নিষেধাজ্ঞা

'মুসলিম শরীফ' ও 'মুসনাদে আহমদে' কিছু হাদীস আছে ঐসব থেকে বুঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস লেখার ব্যাপারে তাঁহার অনুমতি ছিল না; বরং তিনি এইরূপ করিতে নিষেধই করিয়াছিলেন। 'মুসলিম শরীফ' এসেছে-

لا تكتبوا على شيئا إلا القرآن

'আমার নিকট হইতে কোরআন ব্যতীত তোমরা অন্য কিছু লিখিবে না। যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখিয়াছে সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে'। (মুসলিম শরীফ, মোকাদ্দমা ১৮৮ পৃঃ)

মুসনাদে আহমদে আছে হজরত আবু ছাঈদ খুদরী বলেন- 'আমরা রছুলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট বসিয়া যাহা শুনিতাম তাহা লিখিয়া লইতাম। এই অবস্থায় একদিন হুজুর (ছঃ) আমাদের নিকট উপনীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'তোমরা ইহা কি লিখিতেছ?' আমরা বলিলামঃ 'যাহা আমরা আপনার নিকট শুনিতেছি তাহাই লিখিতেছি'। ইহা শুনিয়া রছুলুল্লাহ (ছঃ) বলিলেনঃ আল্লাহর কিতাবের সহিত আবার কিতাব? আল্লাহর কিতাবকে অমিশ্র রাখ। অতঃপর (আবু ছাঈদ খুদরী রাঃ বলেন,) ইহা শুনিয়া আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এক জায়গায় করিলাম এবং সমস্ত জ্বালাইয়া দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলামঃ হুজুর! আমরা কি আপনার হাদীছ মুখে বর্ণনা করিতে পারি?' হুজুর (ছঃ) বলিলেন- হাঁ, মুখে বর্ণনা করিতে পার। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে মনে রাখিও, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার নামে মিথ্যা কথা বলিবে সে যেন তাহার স্থান জাহান্নামে করে নেয়'। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ-১/১৫০ পৃঃ)

জবাবঃ

নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসগুলের তিন ধরনের সমাধান। যেমন:

১.রহিত

২.প্রাধান্য দেয়া

৩. সামঞ্জস্য বিধান

প্রাধান্য দেয়াঃ ইমাম বুখারী প্রমুখ ইমামগণের মতে আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত (প্রথম) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসই নয়; উহা স্বয়ং আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর উক্তি'। [অন্য কথায় ইহা হাদীছে মাওকুফ।] তাই হাদীছ লিখার অনুমতির ক্ষেত্রে যে মারফু' হাদীছ সমূহ আছে তাই প্রাধান্য পাবে। (ফাতহুল বারী-১/১৬৮ পৃঃ)

রহিতঃ হাদীস লিখার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা নিষিদ্ধতার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কেননা অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসগুলো পরের। অর্থাৎ বিদায় হজ্জের সময়ের, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর তিরোধানের অল্পকিছু দিন পূর্বে ছিল। [হা. ইবনে হাজার-]

সামঞ্জস্য বিধানঃ মুহাদ্দিছগণ এই উভয় প্রকার বর্ণনার নিম্নরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। হাফেজ ইবনে হাজার এবং ইবুনস সালাহ রহি. বলেন- মুসলিম শরীফের হাদীসটিকে যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বলিয়া স্বীকারও করা যায় তাহা হইলেও উভয় প্রকার হাদীছের মধ্যে বাস্তবে কোন বিরোধ নেই। কারণ, 'যাহাতে কোরআন ও হাদীছ মিশ্রিত হইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে, সে জন্য যখন কোরআন নাজিল হইতেছিল (এবং নিয়মিতভাবে লেখা হইতেছিল) তখন উহা (শুধু তখনকার জন্য) নিষেধ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অপর সময়ের জন্য অনুমতি ছিল। [মোকাদ্দমা ১৮৮ পৃঃ] ইহাও হইতে পারে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাদীসকে কোরআন এর সহিত একই সাথে লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ভিন্নভাবে লিখিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না।

ইমাম ইবনুছ ছালাহ বলেন- 'লেখার অনুমতি সম্ভবতঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সে সকল লোকের জন্যই দিয়াছিলেন যাহাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়ার আশংকা ছিল এবং নিষেধ সে সকল লোকের পক্ষে ছিল যাহাদের স্মরণশক্তির উপর ভরসা করা যাইত-যাহাতে তাহারা লেখার উপর নির্ভর করিয়া স্মরণশক্তি হারাইয়া না ফেলে।

যুক্তিঃ কুরআন সব কিছুই বর্ণনা করা হয়েছে

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ "আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা" [নাহল-৮৯]

জবাবঃ কুরআন দ্বীনে মৌলিক বিষয়ে কথা বলে কিন্তু হাদীস তার ব্যাখ্যা করে وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ আপনার কাছে আমি 'যিকর' [কুরআন] অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন [নাহল-৪৪]

এ আয়াত তাদের বিরুদ্ধে অন্যতম দলিল। কেননা যদি কুরআন থেকে ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আহরণ সবার পক্ষে সম্ভব হতো, তাহলে কোরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না। অথচ এ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন পাঠানোর পাশাপাশি নবী পাঠানো হয়েছে, যাতে তিনি কোরআনের ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন। নবীর অবর্তমানে এ দায়িত্ব নবীর উত্তরাধিকারী প্রজ্ঞাবান আলেমদের। সুতরাং এ আয়াত থেকে জানা যায়, ব্যাখ্যা [তাফসীর] ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে কোরআন বোঝা সম্ভব নয়। এমনকি ভাষাগত জ্ঞান থাকলেও তা সম্ভব নয়। কেননা মক্কার লোকেরাও আরবি ভাষা বুঝত। কিন্তু তাদের কাছে কোরআন ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্য আয়াতে এসেছে, 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা এর আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।' (সুরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

নিম্নোক্ত বিষয়ে হাদীস মান্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই। যেমন

★সালাত

★যাকাত

★পবিত্রতা

★হজ্জ

★সিয়াম

যুক্তিঃ হাদীস বিকৃত। কিন্তু কুরআন অবিকৃত কেননা তা হেফাযাত করার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন।

َإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون 'নিশ্চই আমিই (সেই সত্ত্বা, যিনি) আল-যিকর নাজিল করেছি এবং আমিই তার হিফাজতকারী। [সূরা হিজর-৯]

জবাবঃ

১. 'যিকর 'শুধু কুরআনকেই অন্তর্ভুক্ত করেনা বরং তা ব্যাপক এর দ্বারা উদ্ধেশ্য হলো দ্বীন- এবং শারিআহ যা নবীজী সা. নিয়ে এসেছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।' (সূরা আন নহল; আয়াত ৪৩)

এখানে আহলে যিকর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যারা দ্বীন এবং শারিআহ পারদর্শী

২. কুরআন বলতে আল্লাহ'র শুধু বাণীসমষ্টিই নয়, তার অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাজিল হয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যতটুকু অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানা দরকার তা সংরক্ষন করাও উপরোক্ত আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে।

তাই নিঃসন্দেহে হাদীস হলো- আর কোরআনের মর্ম ও ব্যাখ্যা প্রিজার্ভ করার রক্ষাকবজ এজন্য, নির্দ্বিধায় বলা যায়, দ্বীন ইসলামের উপর চলার জন্য আল-কুরআনের পাশাপাশি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ (আদর্শ) যথেষ্ট মাত্রায় হিফাজত রয়েছে-

> তাঁর যুগ থেকে চলে আসা নির্ভরযোগ্য মুসলীম উম্মাহ'র মধ্যে পরম্পরা আমলের চর্চার মাধ্যমে

> হাদিস আকারে, যেখানে তাঁর বাণী ও কর্মসমষ্টি বর্ণিত হয়েছে।

যে সকল আয়াত হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব

অসম্ভব # ১: মহান আল্লাহ্ বলেন,

... وَأَقِيمُوا الصَّلٰوة .... "তোমরা সলাত কায়েম করো।" -সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩/২০

এই আয়াতটি বলছে যে, আমাদেরকে সলাত কায়েম করতে হবে। এখন এই সলাত আদায়ের নিয়ম কুরআনে পাওয়া যাবে না। বরং হাদিস থেকে পাওয়া যাবে। তাই বুঝতে হবে যে, এই আয়াতটি হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ২: মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَاٰتُوا الزَّكٰة....

"এবং যাকাত আদায় করো।” -সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩/২০

এই আয়াতটি বলছে যে, আমাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে। এখন যাকাত আদায় করার নিয়মটি কুরআনে পাওয়া যাবে না। বরং হাদিসে পাওয়া যাবে। তাই বুঝতে হবে যে, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৩: মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১০০)

এই আয়াতটি বলছে যে, যদি আমরা প্রথম সাঁরির মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করতে পারি তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত দিবেন। এখন এই মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করতে হলে তাঁদের ইতিহাসও জানতে হবে। তা না হলে আমরা তাঁদেরকে কিভাবে অনুসরণ করবো? আর এই মুহাজির ও আনসারদের ইতিহাস কুরআনে কোথাও খোঁজে পাওয়া যাবে না ইনশাআল্লাহ্। মূলতঃ তাঁদের ইতিহাসগুলি হাদিসে পাওয়া যাবে। তাই বুঝে নিতে হবে যে, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৪: মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير.... ۝

“তোমাকে জিজ্ঞেস করে হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করার ব্যপারে। তুমি তাদেরকে বলো, এই হারাম মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়।” -সূরা বাক্বারাহ্, ২/২১৭

এই আয়াতটি বলছে যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। এখন আমাদেরকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হলে জানতে হবে যে, কোন-কোন মাসসমূহ হারাম। কুরআনে কোথাও এই হারাম মাসসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়নি। শুধুবলা হয়েছে যে, চারটি মাস হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র বিধানে ও গণনায় মাস বারোটি আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই। এই মাসসমূহের মাঝে চারটি মাস হারাম।" -সূরা তাওবাহ্, ৯/৩৬

কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়নি কোন চারটি মাস হারাম। মূলতঃ এই চারটি হারাম মাসের নাম হাদিস থেকেই জানা সম্ভব। তাই বুঝে নিতে হবে যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করার মতো অন্যায় কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হলে হাদিস থেকে জানতে হবে যে, কোন চারটি মাস হারাম। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৫: মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة....

"যখন তোমরা যমীনে সফরে থাক তখন সলাত কসর (কম) করাতে কোন দোষ নেই।" -সূরা নিসা, ৪/১০১

এই আয়াতটি বলছে যে, যখন আমরা সফরে থাকবো তখন সলাত কম আদায় করতে পারবো। কিন্তু এই সলাত কম আদায় করার পরিমাণ কতটুকু তা কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। বরং সফরে থাকাবস্থায় সলাত কম আদায় করার পরিমাণটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৬: মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَت . "হাজ্ব হয় নির্দিষ্ট মাস সমূহে।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১৯৭

এই আয়াতটি বলছে যে, এই ফরজ হাজ্বটি পালিত হয় নির্দিষ্ট মাসসমূহে কিন্তু এই নির্দিষ্ট মাসগুলি কোন- কোন মাস তা কুরআনে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বরং এই মাসসমূহের নাম হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৭: মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে ..." -সূরা আহযাব, ৩৩/২১

এই আয়াতটি বলছে যে, রসূলের মাঝে অর্থাৎ তার সমগ্র জীবনীতেই আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে অর্থাৎ তাঁর জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু صلى الله রসূলুল্লাহ এর সমগ্র জীবনের ইতিহাস কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। صلى الله । বরং হাদিসে তাঁর সমগ্র জীবনের ইতিহাস রয়েছে। অতএব বুঝা গেল এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৮: মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ... "হে মু'মিনগন, তোমরা নাবীর প্রতি সলাত (দুরুদ) এবং সালাম পাঠাও।" -সূরা আহযাব, ৩৩/৫৬

এই আয়াতটি বলছে যে, আমরা যেন নাবীর প্রতি সলাত (দুরুদ) এবং সালাম পাঠাই। কিন্তু নাবীর প্রতি সলাত (দুরুদ) পাঠানোর নিয়ম কি তা কুরআনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বরং, সলাত (দুরুদ) পাঠানোর নিয়মটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৯: মহান আল্লাহ্ বলেন,

.... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... "...তোমরা খাও এবং পান করতে থাক, যে পর্যন্ত না তোমাদের জন্য কাল সুতা হতে ফাজরের সাদা সুতা প্রকাশ না পায়...।" -সূরা বাকারা- ২/১৮৭

এই আয়াতটি মূলতঃ কোন সময় থেকে সওম (রোজা) শুরু করতে হবে, তা বলছে। এখন এই কাল সুতা এবং ফাজরের সাদা সুতা বলতে আল্লাহ কোন সময়কে বুঝাচ্ছেন, তা কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। এই আয়াতটি বুঝতে হলে হাদিস

থেকে বুঝতে হবে যে, কাল সুতা ফাজরের সাদা সুতা বলতে আল্লাহ কোন সময়কে বুঝিয়েছেন। অতএব বুঝা গেল এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ১০: মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ....

"তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধর...।" -সূরা আলি-ইমরান ৩/১০৩

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, আমরা যেন তাঁর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরি। কিন্তু আল্লাহর রুজ্জু কি তা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি, বরং হাদিসে আল্লাহর রুজ্জু কি তা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

তাহলে বুঝা গেল যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী। হাদিস ছাড়া মুসলিমগণ কুরআনের সকল আয়াত পালন করতে সক্ষম নন।

আহলে কুরআনদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি

১. প্রথমত কোরআন থেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদা প্রমাণ করতে হবে। এটি প্রমাণ করতে উপরিউক্ত কোরআন থেকে কিছু দালিলিক প্রমাণ দিতে হবে।

২. রাসূলের আনুগত্য সম্পর্কিত আয়াত সমূহ সুন্দর ভাবে বর্ণনা করতে হবে।

৩. এরপর রাসুলের অনুসরণ ছাড়া মুসলিম হওয়া যাবে না এটি প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ কুরআনের দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে রাসুলের অনুসরণ করা আমাদের জন্য ফরজ।

৪. তারা যদি উপরিউক্ত কুরআনের দলিলগুলো খণ্ডন করার চেষ্টা করে তাহলে তারও উত্তর দিতে হবে।

৫. যদি তারা উপরিউক্ত দলিলগুলোর বিপরীতে অন্য দলিল দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তার সঠিক তরজমা ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে হবে।

৬. এরপর যে সকল আয়াত হাদিস পালন ছাড়া সম্ভব নয় তা উপস্থাপন করতে হবে।

৭. সবশেষে হাদিসও আল্লাহর ওহী এটি দলিলসহ প্রমান করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় অস্বীকারকারীরা ভ্রান্তিতে রয়েছে। উলামায়ে কেরামের মতে তারা কাফের। তাই তাদের দ্বীন ও দিল দ্বারা দাওয়াত দিতে হবে যাতে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তে ফিরে আসে।